বলাই – সুনীল সখ্য সমাচার

দেবতোষ ঘোষ

এ ছোটো লেখাটা আমার দু-জন প্রিয় মানুষকে নিয়ে। দু-জনেই বহুরূপীর অভিনেতা। বেশ ভালো অভিনেতা। কিন্তু সেই অর্থে কেউই 'সেলেব' নয়। বলাই সম্পর্কে তবু শম্ভু মিত্র একটুখানি লিখেছেন। আর সুনীলকে চেনাতে হলে সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবি খুব ছোটো ছোটো ক-টি চরিত্র আর একটা জনপ্রিয় টি.ভি. সিরিয়াল। বলাই গুপ্ত আর সুনীল সরকার। দুই প্রয়াত অভিনেতা।

বলাই আমার থেকে বছর দু-একের ছোটো ছিল, যদিও যে-কোনো কারণেই হোক দেখলে তা মনে হত না। কিন্তু বহুরূপীতে বোধহয় দু-তিন বছরের সিনিয়ার।

সুনীল ছিল বছর পাঁচেকের ছোটো। কিন্তু মাথাভরতি টাক আর বুড়োটে ধরনধারণ নিয়ে আমার খুল্লতাত - প্রতিম। সত্যিই, আমার অফিসের এক সহকর্মী সুনীলের সঙ্গে পরিচিত হয় এমনই মন্তব্য করেছিল। তবু, আমি সুনীলের দাদাস্থানীয় আর বলাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল একেবারে তুই - তোকারির।

অথচ বলাইকে আমার প্রথম দেখাটা মোটেই সুখকর ছিল না। আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল — এ কেমন মানুষ! পোশাকে - আশাকে পারিপাট্য তো দূরস্থান, একেবারেই শ্রীহীন, এমন মানুষ বহুরূপীর ঘরে! কিছু একটা খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে চলেছে, কে ওকে কোথায় কীভাবে দেখছে, সে - ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপহীন। সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই বুঝেছি; এই ভ্রুক্ষেপহীনতা, ভয়হীনতা অথচ ভেতরের ভালোবাসায় ভরপুর, নির্ভেজাল মানুষটিই বলাই গুপ্ত। একটা মানুষ এতটা নির্লোভ, সমস্ত ব্যাপারেই এতটা সাত্বিকতা নিয়েও সংসারী, আমাদের সেই বয়সে ভাবনার অতীত ছিল।

পারিবারিক দিক থেকে বলাই দুটি ক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। এক, অভিনয়প্রীতি। হিন্দি চলচ্চিত্রজগতের প্রখ্যাত অভিনেতা বিপিন গুপ্ত বলাইয়ের কাকা। আর এক কাকা বিজন গুপ্তও বহুরূপীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। উত্তরাধিকারের দ্বিতীয়টি হল, কানে কম শোনা। বিপিনবাবু, বিজনদার মতো বলাইয়েরও শ্রবণশক্তির অভাব ছিল। তবে এই অসুবিধাটা বোধহয় বলাইয়ের ক্ষেত্রে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। এ-ব্যাপারটা না থাকলে বুঝি বলাই অভিনেতা হিসেবে আরো খানিকটা এগোত।

আজ একথাটা লিখতে পেরে ভালো লাগছে যে প্রথমদিন যাকে দেখে বিরূপ হয়েছিলাম, যতদিন গেছে, আস্তে আস্তে পরতের পর পরত খুলে বলাই তার স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে আমার কাছে। একেবারে শুরুর দিকে শুনেছিলাম যে বলাই জুট মিলে চাকরি করে, কুলি রিক্রুটের কাজ। তখনকার বিশ্বাসমতো ওকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হ্যারে, হাতা গোটাস?' হাতা গোটানো মানে কুলি - রিক্রুটারবাবুরা ফুলহাতা শার্ট পরে মিলে আসে আর যখন বাড়ি ফেরে তখন ওই ফুলহাতা শার্ট গোটাতে গোটাতে হাফহাতা হয়ে যায়। মনে গোটানো হাতার প্রত্যেকটা ভাঁজে ভাঁজে কুলিদের দেওয়া উপরিটুকু রাখা থাকে। এইটাই দস্তুর। শুনে বলাই এক লহমা আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'যাহ্!' যে-গলায় এই একটুখানি শব্দ ও উচ্চারণ করেছিল তা আমার কান থেকে এখনো মুছে যায়নি। এমন অক্রোধী মানুষও তাহলে হয়! খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। সত্যিই বলাই আমাকে সেই বয়েসে — তখন তো আমরা কেউ তিরিশ ছুঁইনি — আরেকটা ব্যাপারে বিস্মিতই করেছিল। ওর থেকে দলে আমার বয়স কম, যদিও সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই আমি দলে একটা কেউকেটা মানে যাকে বলে 'স্পার্টান্ট' সদস্য, কিন্তু তাতে বলাইয়ের কিছু এসে যায় না। এমনকী প্রত্যেকেই যখন নতুন নাটকে একটা উল্লেখযোগ্য চরিত্র পেতে উৎসুক, বলা ভালো প্রায় হিংস্রভাবেই উৎসুক তখন বলাই-ই নির্বিকার। ওর বক্তব্য হল দল চালাতে গেলে এরকম সব করতেই হয়। প্রথম প্রথম ওর এই নিরাসক্তি, নির্বিকারত্ব, আমার কাছে খানিক দেখানেপনা মনে হলেও খুব তাড়াতাড়িই বুঝেছি ও সত্যি সত্যিই নির্বিকার, নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত। আমরা যখন চিরকালের ইজারা নিয়ে দলে কিংবা দৈনন্দিন বাঁচাতে বিব্রত, ওর চোখে তখন চিরদিনের কিছুর জন্যে আকুতি। অথচ একটা পার্ট দিলে কি করত না? খুব খুশি হয়েই করত। একটা মনে রাখার মতো ঘটনা বলি। সেটা বোধহয় ১৯৭৮। নানা ঘটনার ফলে এই অধমের ওপর নির্দেশনার দায়িত্ব পড়েছিল কলকাতা দূরদর্শনের জন্যে একটা টেলি সিরিয়ালের। এ-খবর শুনে বলাই কেমন সোজাসুজি বলেছিল, 'আমাকে একটা পার্ট দিবি তো?' কী সহজ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ একটা প্রার্থনা! আমার মাথায় ছিলই, তবু দূরদর্শনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বলাইকে আভিনেতা হিসেবে নিতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম।

বলাই এইরকমই। বিয়ে - থা করেছে, ঘরসংসার করেছে, আবার যেন কিছুর মধ্যেই নেই। মনে পড়ছে ১৯৬১-র ৩ কি ৪ জানুয়ারি সন্ধ্যের ঝোঁকে মুম্বাইয়ের (তখন বম্বে) ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামমুখো হাঁটছি সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'শ্যামা' দেখতে। পথে বলাইয়ের সঙ্গে দেখা। মেজোকাকা কি সেজোকাকা বিপিন গুপ্তের বাড়িতে সারাদিন কাটিয়ে ফিরছে। শাদা ধুতি পাঞ্জাবি — বলাইকে ওই এক - আধবারই সুশোভন দেখার স্মৃতি — মুখে জলন্ত সিগারেট, বগলে একটা প্যাকেট। তার মধ্যে কী কিছুতেই বলবে না, কিন্তু আমিও নাছোড়। শেষপর্যন্ত আবিষ্কৃত হল, বউয়ের জন্যে একখানা শাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে এই সাবধানবাণী, 'তুই আবার সবাইকে গাবিয়ে বেড়াস না!' আবার এই বলাই আর তার বউয়ের কথা। প্রসঙ্গটা অন্য, আর সময়টাও আরো পরের। 'আমার বউ না খালি বলে, ''আচ্ছা তুমি যে এত ঠাকুরকে ডাকো তাহলে আমাদের এই কষ্ট কেন?'' আচ্ছা বল্, আমি কি ঠাকুরকে বলতে পারি কষ্টের কথা, বলতে পারি আমাকে টাকা দাও, হ্যাঁ?' না বলেনি বলাই নিজের কষ্টের কথা কখনো। আগের সারাটা রাত শ্বাসকষ্ট নিয়ে বসে থাকার পর শেষের সেই সকালেও ডাক্তারকে বলেছে, 'কোনো কষ্ট নেই।' খানিক পরেই সব দুঃখ - কষ্টের বাইরে। কিন্তু এইসঙ্গেই মনে পড়ে 'রাজা' নাটকে শম্ভু - সুধনের একজন হয়ে বলাইয়ের আর্ত প্রশ্ন ঠাকুরদাকে, 'তবে আমার দশাই বা এমন কেন?' —এতটাই জীবন্ত সেই জিজ্ঞাসা যে তার অনুরণন আজো আমার শ্রবণে অম্লান। আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে, নিজের কষ্টটাকে চেপে রাখার বেদনাটাই এরকম অন্তরাত্মার আর্তনাদ হয়ে বলাইয়ের অভিনয়ে প্রকাশ পায়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে 'রাজা অয়দিপাউস' -এ জিয়ুসের পুরোহিতবেশী বলাইয়ের সেই দুর্দশাপীড়িত দেশবাসীর দুর্ভাগ্যের মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন। মূর্ত, জীবন্ত।

আমি ঠিক জানি না, তবে এমনটা হতে পারে, কানে শোনার ব্যাপারে বলাইয়ের অসুবিধাটা হয়তো। সাধারণ কথোপকথনভিত্তিক অভিনয়ের অন্তরায় হত, হয়তো তাই উচ্চকিত প্রকাশভঙ্গিতে বলাইকে খুব সাবলীল মনে হত।

সংসারী বলাই আর সংসার - উদাসীন বলাইকে নিয়ে আরেকটু বললে বোধহয় মানুষটাকে আরো একটু বোঝা যাবে। এবারের দুটো গল্পই ছেলেকে নিয়ে।

সেটা বোধহয় ষাটের দশকের মাঝামাঝি। রাস্তায় ঠোঙার থেকে ঢেলে কিছু খেতে খেতে আসছে বলাই।। বাঁ - বগলে বিরাট একটা ঠোঙা। ওটা কী রে প্রশ্নের জবাহে উত্তর : 'ল্যাকটোজেন।' সেই সময় মাঝেমাধ্যেই বাজার থেকে এই বস্তুটি উধাও হয়ে যেত।

এবার একটু থেমে সংযোজন : 'খেয়ে নিক, খেয়ে নিক। পরে তো আলুসেদ্ধ আর ভাত খেতে হবে।' এর পরের গপ্পোটা তিন - চার বছর পরেকার। বলাইয়ের বাড়ির কাছে 'পুতুলখেলা'র অভিনয়। বলাই তখন বাড়ির কাজের লোক 'হেমন্ত' করে। সন্ধের প্রথম ঝোঁকটাতে সবে নাটক শুরু হয়েছে। শম্ভুদা মঞ্চে উঠতে গিয়ে থমকে বললেন, 'ও বাচ্চাটা কার? মশায় তো খেয়ে ফেলছে!' তাকিয়ে দেখি সাজঘর আর উঁচু বাঁধা মঞ্চের মাঝখানের একটুখানি অন্ধকার জায়গায়, পাশাপাশি রাখা ফোল্ডিং ভেনেস্তা চেয়ারে শুয়ে বলাইয়ের ছেলে। পাশে ঝুলে - থাকা হাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মশা মেরে চলেছে। বলাইকে বললাম। উত্তর এল, 'খাক গে। ওকে তো বারণ করেছিলাম আসতে। দাম তো দিতেই হবে।' বলাইয়ের কথা বেশ শোনবার মতো ছিল। আমি তো বটেই শম্ভুদাও বলাইয়ের মনোযোগী শ্রোতা ছিলেন। 'কথামৃত'র মতো খুব সহজ কিন্তু কোথাও একটা গভীরতা ছোঁয়া থাকত। অন্যকে নিয়ে মজা করত, কিন্তু বিঁধিয়ে কথা বলা, মানে যাকে বলে 'ম্যালিস' তা কখনোই থাকত না।

এ একটা নাটক, নতুন কেউ করছিল, শম্ভুদা টানা তার পুরো মহলা দেখলেন। বলাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শম্ভুদা কী বললেন মহলা দেখে?' একগাল হেসে বলাইয়ের উত্তর, 'বাড়ির গিন্নি বললেন, বড়ি দিয়ে রাখো, মাঝের ঝোল হলে দেওয়া যাবে।' অর্থাৎ এখনও পাতে দেবার মতো হয়নি। মহলা চালিয়ে যাও।

অন্য সন্ধে। বার্ষিক সাধারণ সভার আগে পুরেনা কমিটি শেষবারের মতো বসেছে। খুব সন্তর্পণে ঢুকে বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে চোখেই জানতে চাইল, ব্যাপারটা কী? জানার পরে সরব বলাই, 'এই বিয়ের দিনে আশীর্বাদটা আমার একেবারে ঠিক লাগে না।'

মনে পড়ছে ৬৪-র শুরুতে মুম্বাইয়ের (তখন বম্বে) কথা। ক-দিন ফাঁকা ছিল। তার মধ্যে একদিন সকালে মেয়েরা কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে, চড়নদার বলাই। দুপুরের খাওয়ার সময়ের একেবারে মুখে সকলে ফিরছে। মেয়েরা রেগে আগুন, ফুটছে। 'দেবতোষ, আর কোনোদিন তুমি বলাইকে আমাদের সঙ্গে দেবে না। কোনো কিছু দেখতে দেয় না!' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সহাস্য বলাইয়ের বক্তব্য, 'আমি বললাম, সবই তো ছেঁড়া ন্যাকড়া হবে, অত দেখার কী আছে!' আমি তো হতবাক।

পরের গল্পটা দিল্লিতে, সত্তরের মাঝামাঝি। এটা একটু আমিষ। নর্থ এভিনিউতে সাংসদের ডেরায় সেবার আমাদের আস্তানা। বিরাট বিরাট ঘর। একদিন সকালে আমরা, সেই ঘরের চার বাসিন্দা, আমাদের সকলের পরিচিত এক অল্পবয়সি বিবাহ-বহির্ভূত ব্যাপার নিয়ে মুখর। চুপচাপ শুনছে বলাই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বলাই শুনছিল?' এক মুহূর্তও নষ্ট না করে উত্তর এল, 'ওকে বলিস, টিফিনটা বাইরে করছে করুক, ভাতটা যেন বাড়িতেই খায়।'

বলাইয়ের মতন এমন আশ্চর্য মহৎপ্রাণ বন্ধু আমার ছিল না, এখনো নেই। যে কাজগুলো খুবই ঝামেলার এবং বাজে, যেমন স্টেশনে কুলির সঙ্গে দরাদরি, বলাই সেই কাজগুলিই অনায়াসে করে দিত। হাসিমুখে। খুব নাক ডাকত বলাইয়ের, তাই যখন অভিনয় করতে গেছি বাইরে, বলাইকে একেবারে শেষপ্রান্তে কোনো ঘর, কখনো আউট হাউসে শুতে বাধ্য করেছি। আমার খারাপ লাগলে কী হবে, বলাইয়ের কোনো বিকার নেই। 'কী আছে।'

একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল বলাইয়ের, নিজের পোশাক সম্পর্কে একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের উদাসীনতা। মানানো, না-মানানোর কোনো তোয়াক্কা নেই। যখন আমরা বাইরে যাই অভিনয় করতে, সবাই প্রাণপণে চেষ্টা করে যতটা সম্ভব সুবেশ থাকতে, ব্যতিক্রম ছিল বলাই। ধুতি-পাঞ্জাবি বা প্যান্টের সঙ্গে অদ্ভুত সোয়েটার কিংবা প্যান্ট আর একটা গাঢ় নীল — খালাসিদের নীল— পুলওভার আর তার ওপরে একটা হাফহাতা হাওয়াই শার্ট। পায়ে সবসময় সস্তার চটি। অবশ্য এই কিন্তু পোশাকের দরুন সুবিধে যখন যা পাওয়া যেত তা আমরা পুরোমাত্রায় উশুল করেছি। এলাহাবাদ থেকে ফিরছি, হঠাৎ আমাদের একজনের — লতিকাদির, বেশ অসুস্থ — খানিকটা গরমজলের প্রয়োজন হল। ঠেলা বুঝুন, চলন্ত ট্রেনে যেতে যেতে! অগত্যা বলাইয়েরই শরণাপন্ন হলাম। কোনো হেলদোল নেই। ঠোঁটে সদ্য ধরানো সস্তা সিগারেট, দু-হাতে দুটো পলিথিনের বালতি নিয়ে পরের স্টেশনে নেমে গেল বলাই। ট্রেন মিনিট পাঁচেক থামবে। ভিতের ভিতরে সিঁটিয়ে আছি। টেন ইনচার্জ হয়ে হুকুম তো করে দিলাম কিন্তু ...। কী আশ্চর্য, দু-তিন মিনিটের মধ্যে দু-বালতি ধোঁয়া - ওঠা গরম জল, ঠোঁটে সেই জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে মধুসূদন - বলাই! নিজের জায়গায় বসে একগাল হেসে জানাল, রেলের রিফ্রেশমেন্ট রুমের রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই সেখানকার লোকজন শশব্যস্ত, 'ড্রাইভারসাবকো পহলে ছোড় দো' বলে গরমজল দিয়ে তারা স্বস্তিতে, যেন ট্রেন ঠিক সময়ে ছাড়বে; আর ওই নীল খালাসির পোশাকের কল্যাণে আমরা হতবাক। পোশাকে সামান্য পারিপাট্য, মানে শাদা ধবধবে ধূতি - পাঞ্জাবি যা দু-একবার দেখেছি তা ওই মুম্বাইয়ে। তার কারণ ওখানে বলাইয়ের কাকা হিন্দি ফিল্মের স্বনামধন্য বিপিন গুপ্তের বাড়ি। সেখানে বলাইকে যেতেই হত এবং খুড়তুতো ভাইয়েরাও আসত। তাদের কথা মনে রেখেই মুম্বাইয়ে বলাইয়ের সামান্য সুবেশ।

অভিনেতা হিসেবে বলাইকে আমার প্রথম চোখে পড়ে, মানে চোখ ধাঁধিয়ে যায় ১৯৫৮ সালে মহাজাতি সদনে 'পুতুলখেলা'র প্রথম অভিনয়ে মুটের চরিত্রে দেখে। পোশাকে - আশাকে, ধরনধারণে নিও - রিয়ালি্মের মুখে একেবারে ঝামা ঘষে দিয়েছিল। তারপর ওই নাটকেই হেমন্ত; ''রক্তকরবী'তে প্রথমে গোকুল, পরে গজ্জু; 'মুক্তধারা'য় শিবতরাইয়ের গণেশ সর্দার; 'রাজা'তে ঠাকুরদার দলে শম্ভু - সুধনের একজন; 'রাজা অয়দিপউস' -এ জিয়ুসের পুরোহিত; 'বাকি ইতিহাস' -এ বেলিফ তো খোদ শম্ভু মিত্রের তারিফ কুড়িয়েছে। এছাড়াও 'ছেঁড়াতার', 'কিম্বদন্তী', 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'গালিলেও' প্রমুখ নাটকে বলাই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে 'ঘরে বাইরে' প্রয়োজনায় পঞ্চুর চরিত্রাভিনয় আমার কাছে লা-জবাব। শ্রবণশক্তির অসুবিধা বলাই গুপ্তকে অভিনেতা হিসেবে আরো খানিকটা এগোতে দিল না এটাই দুঃখের।

সুনীল বহুরূপীতে এসেছিল ১৯৫৯ -এর শিক্ষণশিবির থেকে। এই শিবিরেরই ফসল অরুণ মুখোপাধ্যায়, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়। বিভাস চক্রবর্তী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত সত্যেন মিত্রও ছিলেন এই সময়ের শিক্ষার্থী

সুনীলকে চাক্ষুষ করেছিলাম শিবির শুরু হিওয়ার আগে এক সন্ধেয় নাসিরুদ্দিন রোডের মহলাঘরের দরজায়। টোকা শুনেই বেরিয়ে আসতে সুনীল জানাল যে শিক্ষার্থী হবার জন্যে সে একটা চিঠি দিয়েছে কিন্তু ওর তো কোনো ব্যাকিং নেই, তাই এই অচেনা - আমি যদি একটু দেখি! আমি ওকে আশ্বস্ত করেছিলাম ব্যাকিং - এর কোনো প্রয়োজন নেই, যোগ্যতা থাকলে হবে। তাই হয়েছিল; সুনীল নিজের যোগ্যতাতেই বহুরূপীতে এসেছিল। এর আগে সুনীল সুধী প্রধানের উদ্যোগ 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' -এর একজন ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে আয়কর দপ্তরের কর্মী, বাড়তি ছিল টাইপিং-এ দক্ষতা, সুনীল যেটাকে 'বাক্স বাজানো' বলত। এ-ব্যাপারটা দলে ওকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে। থাকত আমার বাড়ির কাছাকাছি, তার ওপর বহুরূপীতে তখন আমার যে কাজ, অর্থাৎ রিকুইজিশন -এর ব্যবস্থাপনা, সেখানে আমার সহকারী। এইসব মিলিয়ে শুরু থেকেই সুনীল আমার খুব কাছের মানুষ ছিল। আমাকে ভালোওবাসত খুব। আজ মনে পড়ছে সুনীলের একটা বার্ষিক কৃত্য ছিল নতুন বছরের শুরুতেই আমাকে একটা ফুল পেজ ডায়েরি দেওয়া, তাও আমার নিজের হাতে।

আমৃত্যু ও সেই অভ্যেস বজায় রেখেছিল। আমরা দু-জনেই থিয়েটার থেকে ছিটকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও এত ব্যত্যয় ঘটেনি।

ঈশ্বর সুনীলকে অনেক কিছুই দিয়েছিলেন। চোখে পড়বার মতো দুটো বড়ো বড়ো গভীর চোখ, মাথা - ভরা টাক নিয়ে মুখটাই একটা অন্য ধরনের 'লুক', গলার আওয়াজটিও খুব ভালো, বেশ মানানসই চেহারা। মানুষ হিসেবে ছিল ঘোর সংসারী, খুব হিসেবি (যেটা পরে ওর ক্ষতিই করেছে বলে আমি মনে করি)। ঠিক বয়সে চাকরি পেয়েছে, ঠিক সময়ে বিয়ে (আমাদের আগেই)। পারিবারিক সূত্র পাওয়া একটুকরো জমিতে এই কলকাতা শহরে মাথা গোঁজার মতো একটা বাড়িও করে ফেলেছে ঠিক সময়ে, আমাদের অনেকের থেকে অনেক আগে। মহেন্দ্র গুপ্তের (সুনীলের উচ্চারণে 'মোয়িন্দ্র') থিয়েটার দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে থিয়েটার করতে এসে সব থেকে নামী দলে থিয়েটার করার সুযোগ পেয়েছে এবং সচরাচর যে ঘটনা ঘটে না বহুরূপীতে, এসেই নতুন নাটক 'মুক্তধারা'য় একটা উল্লেখ করবার মতো চরিত্র উদ্ধব-এ নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে।

বহুরূপীর বহু প্রয়োজনাতেই সুনীল অভিনয় করেছে। 'দশচক্র' (কালীকিঙ্কর), 'রক্তকরবী' (গোকুল), 'রাজা' (বিরূপাক্ষ ও একজন রাজা), 'ত্রিংশ শতাব্দী' (জনসন), 'রাজদর্শন' (শনি), 'গালিলেও' (বৃদ্ধ) ইত্যাদি। কিন্তু 'দশচক্র'তে কিঙ্করই সুনীলের সেরা চরিত্রাভিনয়। আমি ১৯৫৩ -তে এই চরিত্রেই মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে দেখেছি, কিন্তু আর - একবার একদম বিপরীত মেরুতে সুনীলের এই চরিত্রায়ন খুবই প্রশংসনীয়। 'রাজা'তে বিরূপাক্ষ আর 'রাজদর্শন' -এ শনি, এ-দুটিও চোখে পড়বার মতো অভিনয়। হ্যাঁ, বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির সম্মিলিত অভিনয় 'রক্তকরবী' -তে সুনীল করেছিল গোকুল। বেশ ভালো।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি অনেকখানি প্রাথমিক মূলধন নিয়ে এসেও সুনীল আরো অনেকদূর যেতে পারল না তার কারণ সুনীল বড্ড বেশি নগদ বিদায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল। অভিনেতা হিসেবে নিজেকে আরো পরিমার্জনা না করে দূরদর্শন আর চলচ্চিত্রের সহজ স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। সুনীলের ঘোর হিসেবি মনটা ওকে এদিকে - ওদিকে ছড়িয়ে দিল, সংহত হতে দিল না, আর তার ফলে বাংলা থিয়েটার একজন বলবার মতো অভিনেতাকে নটেতেই মুড়িয়ে যেতে দেখল, এইটাই খেদ।

যা হোক আসল কথায় আসি। সুনীল আর বলাইয়ের বন্ধুত্ব। সতি বলতে কি, বিশ্বসংসারী বলাইয়ের সঙ্গে ঘোর সংসারী সুনীলের জুটি বাঁধার রসায়নটা আমার কাছে পরম আশ্চর্যের, এবং সেটাই তো ঘটনা। প্রতি মুহূর্তেই মতের অমিল হচ্ছে দু-জনের, অথচ কেউ কারোকে বিশেষ করে সুনীলের বলাইদা ছাড়া চলবে না। এমনকী এসি রুম দিলেও নয়। বলাইদার সঙ্গে সাধারণ ঘরেই থাকবে সুনীল। বলাই অনেকখানি নির্লিপ্ত থাকলেও সুনীলের প্রতি ওর চোরা-টান প্রকাশ পেয়ে যেত। সুনীলকে যত ভালোবাসত তেমনি পেছনে - লাগা থেকেও পিছিয়ে থাকত না বলাই।

মনে পড়ছে ১৯৬৪-র মুম্বাইয়ের দিনগুলো। আমরা ছিলাম ক্রফোর্ড মার্কেট এলাকার একটা সস্তা হোটেলে। যথারীতি বলাই সুনীল একটা ছোট ঘরে, সঙ্গে প্রদীপ চক্রবর্তী। সেবারে ওখানে চারটে অভিনয়ের জন্যে দিন দশ - বারো থাকতে হয়েছিল, ফলে চিঠিপত্তর আসা - যাওয়ার ব্যাপার ছিল। তা সেদিন দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পরে ঘরে ঘরে কমলালেবু বিলোতে ওদের ঘরে গিয়ে দেখি সব ছেলেপুলেই সেখানে এবং বেশ একটু উত্তেজক - মজা। কী ব্যাপার? ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি সুনীল নিজের খাটে একেবারে দেয়াল ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে বসে দু-হাতে বাঁচাচ্ছে একটা খাম - খোলা চিঠি এবং সামনে হুমড়ি খেয়ে উদ্যত থাকা বলাই, মুখে কিন্তু জ্বলন্ত সিগারেট। আমাকে দেখেই সুনীল ডুকরে কেঁদে উঠল, 'আমার চিঠি, আমি দেখাব না।' আমি ভর্ৎসনা করাতে বলাইয়ের সহাস্য উত্তর, 'আমি তো চিঠি দেখতে চাইছি না। শুধু সম্বোধন আর শেষটা দেখলেই হবে।' সুনীল না-দেখাবার সিদ্ধান্তে অনড় কেননা সেটা কলকাতা থেকে আসা গোপন চিঠি, ও তখন প্রেমে হাবুডুবু। যা হোক, শেষপর্যন্ত বলাইদারই জিত। শুরু আর শেষ দেখে বলাইয়ের উক্তি, 'সু' আর 'ল', মানে এ তো তোর একরকম শূল হল। সুনীলের 'সু' দিয়ে শুরু হয়ে ও তরফের নামের শেষ অক্ষর 'ল' দিয়ে চিঠি শেষ হয়েছে। ক্যাম্প - ইনচার্য আমি অটল গাম্ভীর্য নিয়ে বেরিয়ে আসি, হাসিতে ভেঙে পড়বার আগে।

দ্বিতীয় ঘটনাটার স্থান একই ঘর, দু-একদিনের মধ্যে বেশ রাত্রে, পাত্ররা সেই একই। শুতে যাবার আগে আমি রোঁদে বেরিয়ে ওদের ঘরের দরজায় মুখ বাড়াতেই বলাইয়ের সাহস্য-সাদর - আহ্বান, 'দেবতোষ দ্যাখ্, দ্যাখ্।' সুনীল নিজের বিছানায় শিবনেত্রে চিত হয়ে শুয়ে, মুখটা করোটির মতো শাদা! প্রদীপের কথামতো, যার মধ্যে বলাইয়ের সায়ও আছে, শোবার আগে সারা মুখে পুরু করে বোরোলিনের প্রলেপ দিলে, বিশেষ করে ভাঙা গালের গর্তে, মুখটা ভরাট হয়ে যায়। কিছু বলবার আগেই আমাকে এগোতে দেখে, সুনীলের আর্ত জিজ্ঞাসা, 'আর কবে মাখব?' সত্যিই তো। এ প্রশ্নের উত্তরে হাসব না কাঁদব আমি বুঝতে পারি না।

পরের ছবিটা এলাহাবাদের। সকালে স্টেজে সেটের কাজ সেরে সবাই রিকশায় ফিরছে দুপুরে খাবার জন্যে। বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে আমার চক্ষুস্থির। রিকশা ঢুকছে, সীটে বলাই আর মুকুন্দ। প্যান্টের ওপর পুলওভার আর ওপরে বোমানান রঙের হাওয়াই শার্ট, গলায় জড়ানো বেখাপ্পা মাফলার আর মুখে যথারীতি জ্বলন্ত সিগারেট। সুশোভন স্মিতহাসে মুকুন্দ পাশে। কিন্তু সুনীল? সুনীল কই? সুনীল কই? তিনজনেরই তো একসঙ্গে ফেরবার কথা। অবাক হয়ে আবিষ্কার, দু-জোড়া পায়ের মধ্যে রিকশার পাদানিতে তিন মাথা এক করে খুনখুনে বুড়োর মতো বসে সুনীল। এইভাবে প্রাপ্তবয়স্ক কেউ, জোয়ান বয়েসে বিশেষ করে কলকাতার বিখ্যাত নাট্যদল বহুরূপীর সঙ্গে আসা একজন অভিনেতা যে রিকশায় চড়তে পারে তা আমার বোধের আগম্য। হ্যাঁ তাই, কেননা বলাইয়ের হুকুম, সুনীল যেহেতু ভাড়া শেয়ার করবে না, তাই সীটে নয়, এমনকী কোলেও বসতে পারবে না! কিন্তু একসঙ্গে তো আসতেই হবে। অগত্যা।

এর একেবারে বিপরীত ছবি পুনেতে। সেখানে খুব সকালবেলা খাটের ওপর লুঙ্গির কষি আলগা করে আদুড় গায়ে বলাই বসে আছে, হাতে আর গলায় ঝুলছে প্রচুর কবচ - তাবিজ- মাদুলি আর পেছনে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসা সুনীল পাগলের মতো বলাইয়ের পিঠে কিল-চড়-ঘুষি মারছে আর সঙ্গে মুখে অনবরত বলে চলেছে, 'তুমি ভণ্ড, তুমি পাষণ্ড, তুমি ...' ইত্যাদি। আর বলাই নির্বাক, শান্ত নির্বিকার বসে চেয়ে আছে জানালার বাইরে। কী ব্যাপার জানি না। ইচ্ছে করেনি সেদিন ওদের দু-জনের ব্যাপারে ঢুকতে।

কী একটা গান যেন গাইত বলাই — 'ঝঞ্ঝাট ঝামেলা না যেন থাকে / আনন্দে দিন যেন কাটতে থাকে' ... ইত্যাদি। কার লেখা এ গান, সুরই বা দিয়েছিল কে — হয়তো বলাই নিজেই — জানি না! কিন্তু একমাত্র ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে দুলে দুলে ও যখন তন্ময় হয়ে এ-গান গাইত, সে এক দৃশ্য।

এইরকম কত ছবিই তো চোখে ভাসে। সবই বেঁচে থাকার ছেলেমানুষিতে ভরতি।

বয়স হয়েছে ঢের, ভারিক্কি হয়েছি। জ্ঞানীগুণী সঙ্গী করে বেঁচে থাকা আজ। তবু এই মানবিক সম্পর্কগুলোর স্মৃতি থেকে থেকে আমাকে কাঁদায়। —এই কথাগুলো বলতে পেরে আজ খুব তৃপ্তি পেলাম। শান্তি পাচ্ছি বড়ো।